রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক - পরস্পরের চোখে

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক অনুরোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক লেখকরা পরস্পরকে কি চোখে দেখতেন সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করতে। কাজে নেমে দেখা গেল বিষয়টি বহুমাত্রিক ও জটিল। কোনো সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের পরিসরে তাকে ধরানো শক্ত । তার প্রধান কারন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কাল কোনও একটিমাত্র কালে বদ্ধ নয়। উনবিংশ ও বিংশ দুই শতাব্দীর সমান অংশ জুড়ে বৃহৎ বনস্পতির মত সূত্র ধরে আছেন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি সংস্কৃতি প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে পৃথিবীর পরিস্থিতি আমূল বদলে বদলে গেছে। সেই বিষয়ে পরিবর্তমান কালসীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সমসাময়িক পরিস্থিতি আমূল বদলে বদলে গেছে। সেই নিয়ত পরিবর্তমান কালসীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের মতামতও বার বার বদলেছে। এবং একই ব্যাপার ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও। পুরাণকথিত ফিনিক্স পাখীর মত তিনি বারবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন নিজের অতীত অস্থিত্ব থেকে, এবং আমৃত্যু থেকেছেন সর্বাধুনিক। তরুণ বয়সের অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন ঋষিতুল্য প্রজ্ঞায়। প্রথম বয়সে যে সব ক্ষোভ, ক্রোধ বা বেদনার কথা তিনি ব্যক্ত করতে পারতেন, এমনকি কখনও বা হতেন আক্রমাত্মক, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আর হতেন না। তাঁর সমালোচকদের সম্বন্ধেও সে কথা সমানভাবে খাটে। রবীন্দ্রনাথ যখন উদীয়মান, যখন পর্যন্ত জানা ছিল না শেষ অবধি তিনি কোন উচ্চতায় গিয়ে পোঁছাবেন, ততদিন তাঁর সমালোচকেরা যতখানি মুখ খুলে কথা বলতে পেরেছিলেন পরে অবশ্যই তা পারেন নি। দু পক্ষই হয়ে গিয়েছিলেন সাবধানী। তখন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে নিন্দা বয়ে যেত নানারকম অন্তঃশীল পথ বেয়ে (এখনও তা যায়), আর প্রশংসাবচেনের নামে জুটত স্তাবকতা। একই সঙ্গে সত্যিকারের রসিক পাঠক সমালোচকও এলেন শত শত । শব মিলিয়ে পরিস্থিতিটাই গেল বদলে।

২.

আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে তাই আমি একটা সময়সীমার মধ্যে বাঁধতে চাই। মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রজীবনের প্রথমার্ধ আমার বিষয়বস্তু। তখন রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়কিদের কারও পরস্পরের সম্বন্ধে সতর্ক হবার দরকার ছিল না। সেই যুগটিকেই স্মরণ করে দেখা যাক এমনই স্থির করেছি। আরো একটা কথা, যেহেতু এই নিবন্ধটি কোনও গবেষনাকর্ম নয় তাই আমি খুঁটিনাটি সন তারিখ দিইনি, বা তাদের পারম্পর্য কঠোরভাবে রক্ষা করিনি। এমন কোনো তথ্যের আবতারনা করিনি যা আমার পূর্ববর্তী জ্ঞানীজনের জানাননি। স্ব মিলিয়ে সেকালের একটা সাধারণ পরিচয় দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য, তার বেশি কিছু নয়।

উন্মেষপর্ব

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির তিনটি বালক একসঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেছিল সোমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ। তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই বয়সে ছোট বটে, কিন্তু তার স্বভাব ছিল কোনও কোনও বিষয়ে সমবয়সীদের তুলনায় অনেক পরিণত ও সম্পূর্ণ পৃথক। সে খেলাধূলায় অপারদর্শী, মুখচোরা, লাজুক, অন্তর্মুখী এবং অসাধারণ গল্পপ্রিয়। ঐ বয়সেই যে তৎকালপ্রচলিত বাংলা বইগুলি বিবিধ উপায়ে সংগ্রহ করে প্রায় সবই পড়ে ফেলেছে। এমন কি বালকের পক্ষে নিতান্ত দুষ্পাচ্য দীনবন্ধু মিত্রের জামাইবারিক পর্যন্ত। বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকা – বিষবৃক্ষের সুদীর্ঘ পাকগুলা মনের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিত – এ তার নিজেরই স্বীকারোক্তি। বিহারীলাল চক্রবর্তীর অবোধবন্ধু পত্রিকার পুরনো ফাইল থেকে ঐ কবিকে বালক খুঁজে পেয়েছে মনের মত কবি বলে। ওখানেই পড়ছে ফরাসি গল্প পৌলবর্জিনির বাংলো অনুবাদ। ‘পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই।’ ভালোমন্দ বিচারের বয়স সেটা ছিল না। যা কিছু পড়ছেন বা শুনছেন তা মনের ওপর অস্পষ্ট ছাপ রেখে যাচ্ছে মাত্র। সেটাই তখন যথেষ্ট। মাতৃজাঠরে ভ্রুনের মত একটি বিশিষ্ট সাহিত্যসংস্কার এইভাবেই সেই বালকের মনে তৈরি হয়েছে তিলে তিলে।

এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ঠাকুররবাড়ির নিজস্ব শিক্ষাপ্রণালী। স্কুলের শিক্ষায় তাঁর অভিভাবকদের পূর্ণ আস্থা ছিল না তাঁদের বাড়িতে নানা বিদ্যা চর্চার বন্দোবস্ত ছিল। সেখনে ভাষাশিক্ষার জায়গাটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেকালের নিয়মে ইংরাজি তো ছিলই। তার সঙ্গে বাংলা ও সংস্কৃতের ভিতটাও গাঁথা হত খুব শক্ত করে। অল্পবয়সেই রবীন্দ্রনাথকে গৃহশিক্ষকের কাছে সম্পূর্ণ মেঘনাদবধকাব্য তন্ন তন্ন করে পড়তে হয়েছিল। সংস্কৃত শিক্ষা উপক্রমণিকা ও মুগ্ধবোধের স্তর পার হয়ে এতদূর এগিয়েছিল যে কৈশোরেই রবীন্দ্রনাথ সন্ধিসমাসের জটিলতা ভেদ করে, অন্বয় করে, বুঝে বুঝে মূল সংস্কৃত বই পড়তে পারতেন, ছাত্রের পড়া হয়, রসগ্রহণও করতেন, কারণ তাঁরই জীবনীতে জানতে পারি, বহু কর্মহীন নিরালা মেঘাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর তাঁকে –অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগভীর ছন্দের মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে – শুধু তাই নয় জীবনস্মৃতি থেকে জানতে পারি তাঁর ভাষাশিক্ষার আরও এক রকম খবর – 'শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলিমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল, কিন্তু সেইজন্যই অত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাষার মধ্য হইতে একটি আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।' আজ সবাই জানেন এই প্রয়াসের তাৎক্ষনিক ফল ছিল – ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী– আর সুদূরপ্রসারী ফল ছিল রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনায় বৈষ্ণবপদাবলীর নিগূঢ় প্রভাব।

এইভাবে সুশিক্ষিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আসরে নেমেছিলেন। একটি উন্নত ও পরিনত সাহিত্যরুচি তখনই তাঁর মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। সৎসাহিত্যের মানদন্ড কি তা তিনি জানেন। নিজ পছন্দ অপছন্দগুলি তিনি বিশ্লেষণ করে বুঝতে ও বোঝাতে শিখেছেন। হয়তো নিতান্ত অল্প বয়সের আবেগ ও অসহিষ্ণুতা এক আধটু ছিল, কিন্তু প্রথম দিন থেকেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসমালোচনায় কোনো গালিগালাজ, ব্যক্তিগত আক্রমণ বা অন্ধ স্তাবকতা ছিল না। নিজ পছন্দ অপছন্দের কথা জোর গলায় বলতেন। কিন্তু বলতেন সাহিত্যের কারণ দেখিয়ে, সাহিত্যবিচারে অসাহিত্যিক প্রসঙ্গ কখনো আনতেন না।

আত্মপ্রকাশ – রবীন্দ্রনাথের চোখে তাঁর সমকাল ।।

ছাপার আক্ষরে রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করলেন মাত্র ষোল বছর বয়সে সমকালীন তিনটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা নিয়ে। –জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কর্তপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। এই সময়টাতে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে গীতিকবিতার যুগ শুরু হচ্ছে। হেম নবীনের ধারায় বিষয়ানুসারী গীতিকাব্য সে সব। সেইরকম তিনটি বই ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী অবলম্বন করে কিশোর কবি একটি প্রবন্ধ ফাঁদলেন। - খুব একটা ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খন্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কি, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কি অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা এই ছিল যে ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্বিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুমাত্র চিনিবার যো নাই লেখকটি কেমন, তাহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত। - ঠিক কথা, কিন্তু বঙ্কিমি ঢংয়ে লেখা ঈষৎ রঙ্গব্যঙ্গ মিশ্রিত ঐ কাব্য সমালোচনা আজও পড়লে বালকের লেখা বলে মনে হয় না।প্রায় ঐ সময়ের কাছাকাছি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় বেরলো ভারতী পত্রিকা। এখানে তরুণ লেখকের অনেক গদ্যপদ্য প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ সেকালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। সেখানে তিনি নানা যুক্তি দেখিয়ে মেঘনাদবধকাব্যের অসারত্ব প্রমানের চেষ্টা করেছিলেন. কাজটা অনুচিত হয়েছে তা তিনি বুঝেছিলেন পরে। তখন বার বার ক্ষমা চেয়েছেন –"অল্প বয়সের স্পর্ধার বেগে মেগনাদবধকাব্যের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিযাছিলাম। ...অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীব্র হইয়া উঠে। আমিত্ত সেই অমর কাব্যের উপর নখয়াঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার

সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিয়াছিলাম।” কথাটা ঠিকই, তবে আজ সে সমালোচনা পড়লে বোঝা যায় মেঘনাদবধ কাব্যের সমুন্নত ট্রাজিক মহিমা তিনি দেখতে পাননি বটে, কিন্তু যে সব ছোটখাটো ত্রুটিগুলি দেখিয়েছিলেন তাতে ভুল ছিল না। এ কথাও সত্য মধুসূদন রবীন্দ্রনাথের পছন্দের কবি কোনদিনই ছিলেন না, কারণ দুজনে সম্পূর্ণ দুই পৃথক ঘরানার লেখক। একথাও আমার ভুলি না যে রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারে মধুসূদেনের উল্লেখ কত বিরল, এবং মধুসূদনীয় বাক্যবন্ধের প্রভাব একেবারেই অনুপস্থিত। ঐ প্রবন্ধ আর কিছু না করুক সমালোচক রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের দুটি দিক আমাদের কাছে তুলে ধরেছে প্রথমত তিনি নিজ সাহিত্যাদর্শ অস্বীকার করতে ভয় পেতেন না, দ্বিতীয়তঃ অল্প বয়সের ঔদ্ধত্যে অন্যায় আক্রমনও তিনি করেছিলেন এককালে। আচিরকালের মধ্যে তাঁর স্বভাবের ঐ দিকটি যদিও সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে গিয়েছিল, কিন্তু প্রথম যৌবনে ওই স্বভাবের জন্যই তিনি একবার অসার বিতর্কে জড়িয়ে গিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে। তাঁর সারা জীবনের আচরনবিধির পরিপ্রেক্ষিতে সেটা ছিল এরকমের স্বধর্মচ্যুতি। সে কথায় পরে আসছি।

আপাততঃ এটাই দেখি যে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রসসাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনা কোনও ক্ষেত্রেই বাধার সম্মুখীন হন নি। বরং অগ্রজ সাহিত্যিকদের অনেকেরই সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। বিহারীলাল তাঁকে ভালোবাসতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও। রমেশচন্দ্র দত্তের মেয়ের বিবাহসভায় তিনি নিজের গলার মালা খুলে সাদরে এই নবীন কবির গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন এ গল্প তো সুবিদিত। তখন কবির বয়স বাইশ বছর। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর সমবয়সী যে সব কবিরা বাংলাসাহিত্যে দেখা দিলেন, যেমন দেবেন্দ্রনাথ সেন বা অক্ষয়কুমার বড়াল এঁরা রবীন্দ্রনাথকেই তাঁদের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করলেন। নিরভিমান চিত্তে সেকথা স্বীকার করতে তাঁরা দ্বিধা করলেন না। তদুপরি ঠাকুরবাড়ির ছত্রছায়া ও তাঁদের পরিচিত বিদগ্ধমন্ডলীর সমর্থন তিনি পাচ্ছিলেন।সম মনোভাবাপন্ন বন্ধু প্রিয়নাথ সেন বা তারক পালিত তাঁর রচনার গঠনমূলক সমালোচনাও করেছিলেন দু একটি।

অন্যদিকে রবীন্দ্রপ্রতিভা যত নানা বৈচিত্রে বিকশিত হতে লাগল, তাঁর মৌলিকত্ব যতই সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, এবং বোঝা গেল বাংলা সাহিত্যে এক নতুন নক্ষত্রের উদয় হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালের সাহিত্য সম্বন্ধে আর কোনও বিরূপ সমালোচনা থেকে সম্পূর্ণ সরে এলেন। তখন থেকে বরাবর দেখা গেছে তিনি যেখানে প্রশংসা করতে চেয়েছেন প্রাণভরে প্রশংসা করেছেন। (গৌণ ত্রুটিগুলি নির্দেশ করেছেন অবশ্য) । যাঁদের পছন্দ করেন নি তাঁদের সম্বন্ধে তিনি নীরব। এই নীরবতা দিয়েই আমরা তাঁর মনোভাব বুঝে নিই। যেমন শুধু মধুসূদন নন, রঙ্গলাল, হেমন্দ্র, নবীনচন্দ্রদের নিয়ে তাঁর কোনো ভালো লেখা নেই। নিজে নট, নাট্যকার এবং উৎকৃষ্ট অভিনেতা হয়েও, এবং জ্ঞানোদয় থেকে ঠাকুরবাড়িতে নাটকের চর্চা দেখে দেখে বড় হয়ে উঠলেও তিনি সমকালীন সাধারণ রঙ্গালয় এবং সেখানকার দিকপাল নট নাট্যকারদের কথা কিছুই বলেন নি। অপরপক্ষে প্রাণভরে প্রশংসা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের। অসার স্তুতি নয়। বঙ্কিমের ওপরে লেখা আধুনিক সাহিত্যের অন্তর্গত প্রবন্ধটি বঙ্কিম প্রতিভার দিগদর্শন বলা চলে। আজও এ প্রবন্ধ সমান প্রাসঙ্গিক। বিহারীলাল ছিলেন তাঁর অতি প্রিয় কবি। বিহারীলাল বিষয়ে তাঁর রচনায় হয়ত সামান্য অত্যুক্তি আছে, কিন্তু বাংলাসাহিত্যে ঠিক কোন গুনে বিহারীলাল স্মরনীয় তা দেখাতে তিনি ভুল করেন নি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের তিনখানি কাব্যগ্রন্থকে তিনি তিনটি আলাদা আলাদা লেখায় অভিনন্দন জানিয়েছেন। আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে দেখি সমকালীন অপ্রধান লেখকদের কোনও কোনও বই, তাঁর ভালো লেগেছে। ঐ গুলির উৎকৃষ্ট গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন। লেখাগুলি হল শ্রীচন্দ্র মজুমদারের ফুলজানি। শিবনাথ শাস্ত্রীর যুগান্তর, শরৎকুমারী চৌধুরানীর শুভবিবাহ, আবদুল করিমের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস এবং যতীন্দ্রমোহন সিংহের সাকার ও নিবাকার। রবীন্দ্রপ্রবন্ধের যেটা বিশেষত্ব, অর্থাৎ আলোচ্য গ্রন্থপ্রভাবে তাঁর মানসপ্রতিক্রিয়ার বর্ণনা সেই লক্ষণ তাঁর যৌবনের রচনা থেকেই ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছিল।

এই শান্তিপূর্ণ সাহিত্যিক আবহাওযাটাই অবশ্য সেকালের একমাত্র ছবি নয়। অন্য দিকও আছে। বিতর্ক বিবাদ, দলাদলি ও গালাগরিল দিক। পৃথিবীতে চিরকাল মহৎ প্রতিভাকে এইসব আগুনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এটাই তাদের নিয়তি ও গৌরব। রবীন্দ্রনাথই বা বাদ যাবেন কেন।

তর্কবিতর্কঃ স্বধর্মচ্যুতি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে বিংশের গোড়া পর্যন্ত বাঙ্গালী সমাজে দলাদলির একটা প্রধান বিষয় ছিল ব্রাহ্ম হিন্দু বিতর্ক। আজকের দিনে বসে আমরা ধারণা করতে পারব না সেকালে ব্রাহ্ম ও হিন্দুর পারস্পরিক তিক্ততাটা কিরকম ছিল। খানিকটা তার ছবি পাই রবীন্দ্রনাথের গোরা বা শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ, দত্তা, বা অন্যান্য নানা লেখকের রচনায়। সেকালের প্রধান বিদ্বজ্জনরাও এর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। নিন্দা প্রশংসা অনুগ্রহ নিগ্রহের মাত্রা অনেক সময়ই নির্ধারিত হোত কার কি ধর্মীয় পরিচয় তার দ্বারা। বস্তুতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ মতামতের ক্ষেত্র প্রধানত এই দুই শিবিরে বিভক্ত ছিল। তুলনা দিয়ে বলতে হয় কোন্দলপ্রিয় বাঙালীর যে উদ্যম আজ রাজনীতির খাতে বইছে তখন সেটাই উক্ত দুই ধর্মের খাত ধরে বইত। রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে ছিলেন ব্রাহ্ম, কিন্তু পরিনত বয়সে পৌঁছবার পর তিনি সর্বরকম সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করেছিলেন, সন্ধান করেছিলেন মানুষের ধর্ম। কিন্তু সেই উন্নত বোধে উত্তীর্ণ হবার আগে যখন তিনি নিতাই তরুণ, কিছুকালের জন্য জড়িয়ে পড়েছিলেন একটি অসাহিত্যিক ধর্মবিতর্কে, তাও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে। ব্যাপারটা এইরকম।

বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যখন সদ্য পরিচিতি পাচ্ছেন, একজন নবীন শক্তিশালী প্রতিভার উদ্ভব হচ্ছে এই লোকে স্বীকার করছে। সেই সময় মাত্র তেইশ বছর বয়সকালে কর্তাব্যক্তিরা হঠাৎ রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক বানিয়ে দেন। স্থিতপ্রজ্ঞ প্রবীনের প্রাপ্য এই দুর্লভ পদ পেয়ে সম্ভবতঃ তাঁর মাথা ঘুরে যায়, এবং ধারনা হয় সর্বপ্রকারে আদি ব্রাহ্মসমাজের স্বার্থরক্ষা করা তাঁর কর্তব্য। সেই সময় প্রবীন বঙ্কিমচন্দ্র সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম থেকে অবসর নিয়ে নানাপ্রকার তত্বসমালোচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। প্রচার পত্রিকায় তাঁর হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি বেরোচ্ছিল। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে রবীন্দ্রনাথ এক তীক্ষ্ণ ও শাণিত লেখা লিখলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা ছিল তত্বমূলক। হিন্দুর কুসংস্কারের সমর্থন নয়। রবীন্দ্রনাথ সেটা তলিয়ে দেখলেন না। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কাজটাকে অন্যায্য বলেছেন। কারন রবীন্দ্রনাথ এখানে ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। বঙ্কিম যা বলেননি তাই বলেছেন ধরে নিয়ে কলম শানালেন। রবীন্দ্রনাথের লেখার যথার্থ উত্তর বঙ্কিম দিয়েছিলেন, তারপর চুপ করে যান। কিন্তু বিবাদের গন্ধ পেয়ে ততক্ষনে পুলকিত চিত্তে সদলবলে আসরে নেমে পড়েছেন হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা, যাঁরা সত্যসত্যই ধর্মের যাবতীয় আচার বিচার কুসংস্কারের ঘোরতর সমর্থক ছিলেন। বিশেষতঃ শশধির তর্কচূড়ামণির প্রভাবে একদল হিন্দু তখনকার দিনে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন যে প্রাচীন হিন্দুর যা কিছু আচার বিচার প্রত্যেকটিরই বৈজ্ঞানিক কারণ আছে, এবং আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যা কিছু আবিষ্কার করছে সবই প্রাচীন আর্যেরা এককালে করে ফেলেছিল। স্বভাবতঃই এঁরা ছিলেন সংখ্যায় বেশি, ক্ষমতায় বড়, এবং সংঘবদ্ধ। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাধর ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনব্যাপী মসীযুদ্ধ চলেছিল নানা পত্রিকার পাতায়। সেই পর্বে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে কিছু ব্যঙ্গরচনা নির্গত হয়েছিল যাদের দেখতে পাওয়া যায় ব্যঙ্গকৌতুক বইটিতে এবং বিখ্যাত হিং টিং ছট কবিতায়। দীর্ঘদিন চলার পর ক্রমে এ ঝগড়া স্তিমিত হয়ে থেমে যায়। সম্পূর্ণ অসাহিত্যিক এই বিবাদ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উদ্যমের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। এ কাজ তাঁর স্বভাবসঙ্গত নয় বলেও একে বলেছি স্বধর্মচ্যুতি। তবু এ বিবাদ স্মরণযোগ্য কয়েকটি বিশেষ কারনে–

১। বিতর্ক ছিল সম্পূর্ণ অসাহিত্যিক।

২।ব্যক্তিগত আক্রমণ এখানে ছিল না, বিতর্ক ছিল মতামতের।

৩। বিবাদকালে প্রতিপক্ষদের সামাজিক মেলামেশা ও দেশের নানা সৎকার্যে ও সভাসমিতিতে একত্রে কাজ করা বন্ধ হয় নি।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসু দুজনেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভায় কোনদিন সন্দিহান ছিলেন না। বরং ছিলেন গুনগ্রাহী শুভাকাঙ্খী পৃষ্ঠপোষক।

দুজনের দুটি উক্তি দিয়ে এই প্রসঙ্গে উপসংহার টানি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি “আমার বিরুদ্ধে কেহ কখনো কোনো কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত তাহার কোনো উত্তর করি নাই। কখনও উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন। রবীন্দ্রবাবু

প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব, এবং আমার প্রীতি যত্ন প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুনবয়স্ক। যদি তিনি দু একটা কথা বেশি বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য। তবে যে এই কয় পাতা লিখিলাম তাহার কারন এই রবির পিছনে একটা ছায়া দেখিতেছি।”

চন্দ্রনাথ বসুর উক্তি – “রবীন্দ্রনাথ, তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই। তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ উহার বৈচিত্র্য যেমন , প্রভাও তেমনি, আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত।”

।।রবীন্দ্র বিদুষণ।।

এইভাবে প্রবীনের পক্ষে স্নেহ ও সাবধানবানী, এবং রবীন্দ্রপক্ষে বিনম্র স্বীকৃতির দ্বারা ‘ধর্মকলহ’ মিটে গেল বটে, কিন্তু তরুন বয়সের হঠকারিতার যে প্যান্ডোরার বাক্সটি রবীন্দ্রনাথ খুললেন তার প্রভাব সহজে মিটল না। অন্তরালে তাঁর যে সব সাহিত্যিক শত্রুরা ছিল তারা এর পর সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়বার একটা সূত্র পেয়ে গেল। শত্রুতা কেন, এবং কারাই বা সেই শত্রু? সেই প্রসঙ্গে নামবার আগে দু একটা প্রাসঙ্গিক কথা সেরে নিতে হবে।

সব সাহিত্য একরকমের নয়। কিছু লেখা থাকে গড়পড়তা মানুষের পছন্দের, কিছু এলিট গোষ্ঠির। যে সব লেখা সহজে বোঝা যায়, যাতে প্রচলিত মূল্যবোধে আঘাত লাগে না, এবং যে সব লেখা সমসাময়িক জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে পাঠককে কোনও গুরুতর প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে চিত্তে সংশয় ও বিভ্রান্তি জন্মায় না, যে সব লেখা সহজেই জনপ্রিয় হয়। যে সব লেখা তার বিপরীত তাদের পাঠকগোষ্ঠী সীমিত। সে সব রচনা চটজলদি জনপ্রিয় হয় না। এবং অনেকসময়েই নানাপ্রকার বিতর্ক তাদের সঙ্গে লেগেই থাকে। রবীন্দ্ররচনা প্রথম থেকেই দ্বিতীয় শ্রেনীর। কৈশোরকাল অতিক্রম করে যুবক রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্যুৎগতিতে উর্ধাকাশে উঠতে লাগলেন তাতে অনেকেরই ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। বোদ্ধারা প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু অনেকেই, এবং সংখ্যায় তাঁরাই বেশি, বুঝে উঠতে পারছিলেন না রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি বলতে চাইছেন। তার ওপর গল্প, উপন্যাস প্রবন্ধে তিনি প্রচলিত ধর্ম সমাজ রাজনীতি নিয়ে এমন অনেক প্রশ্ন তুলেছিলেন যা সনাতন মূল্যবোধের সঙ্গে মেলেনা, যেমন বিসর্জন। অনেকেই ভেবে পাচ্ছিলেন না রবীন্দ্ররচনা ঠিক কি – বৃহৎ প্রতিভার উচ্ছ্বাস, না উল্কার জ্বলে ওঠা, না পাগলের প্রলাপ। সনাতন জনমতের যাঁরা ধারক ও বাহক, যাঁদের হাতে সমাজের বড় অংশের অভিভাবকত্ব তাঁরা কি বলেন এই বিষয়ে অনেকেই ছিলেন অপেক্ষমান। এইবার সময় বুঝে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারীদের ওপর আক্রমন শুরু হল। যদি হত মতামতের যুদ্ধ বা সাহিত্যের দোষগুননির্নায়ক সমালোচনা তাহলে দোষের কিছু ছিল না, কিন্তু যেটা শুরু হল তা সাহিত্যসমালোচনার নামে ব্যক্তিগত আক্রমণ, একেবারে খিস্তি খেউড়ের পর্যায়ে নেমে যাওয়া আক্রমণ। প্রধান কারণ বড়র প্রতি ছোটর ঈর্ষা। আর তাছাড়াও, রবীন্দ্রনাথকে নিন্দা করবার বাড়তি কতকগুলি সুবিধা ছিল। সেগুলি এইরকম–

১। নিন্দুকেরা ছিলেন সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী, ঐতিহ্যের সমর্থন ছিল তাঁদের পক্ষে অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ একা। কোনও গোষ্ঠীবদ্ধ সমর্থকদল তাঁর ছিল না।

২। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবে ভদ্র, গালির উত্তরে পালটা গালি দেবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি তাঁর ছিলনা। তাঁর গুণগ্রাহীরাও মোটামুটি সেইরকম।

৩। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম, হিন্দুসমাজের একটি সংখ্যালঘু অংশে তাঁর অবস্থান। তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি উস্কে দেওয়া যায়।

৪। তিনি বড়ঘরের ছেলে, রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছেন, খেটে খেতে হয় না। তাঁর চেহারা, চালচলন, লাজুক স্বভাব রমনীজনোচিত কোমল। তাঁকে ব্যঙ্গ করে মজা জমানো সহজ।

খেলাটা শুরু করেছিলেন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সেকালের প্রকাশনার জগতে ইনি একজন বিশিষ্ট লোক। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ভাষার উপর অসামান্য দখল সম্পন্ন লোক। শানিত ও ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ ভাষায় ছিল তাঁর বিশেষ ক্ষমতা। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সাহিত্য পত্রিকাটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন, এবং সেই বিজ্ঞাপনহীন শুধুমাত্র গ্রাহক চাঁদা নির্ভর যুগে, যখন অধিকাংশ পত্রিকাই অর্থাভাবে স্বল্পায়ু হত, তিনি লাভজনকভাকে সাহিত্য চালিয়েছিলেন টানা একত্রিশ বছর, আমৃত্যু।

মতামতের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন হিন্দুত্ববাদী, প্রাচীনপন্থী, তবে খুব গোঁড়া নন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আক্রমনের অভিমুখ ধর্মমতের দিক থেকে ছিল না। রবীন্দ্রসাহিত্যকেই তিনি আগাগোড়া নস্যাৎ করতে চাইলেন প্রথম থেকেই একটা চড়া সুরে নিজেদের বক্তব্যকে বেঁধে। কোনও যুক্তির ধার দিয়ে তাঁরা গেলেন না। তিনি এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা গোড়া থেকেই এই ভঙ্গী নিলেন যে রবীন্দ্রসাহিত্য যে একেবারেই অসার যে বিষয়ে তো কোথাও কোনো সন্দেহই নেই। কেবল ভরসা করে লোকে সেটা বলে উঠতে পারছে না। কারন তিনি বড়ঘরের ছেলে, ধনী লোক, ধামাধরা পত্রিকা ও প্রকাশকদের দিয়ে পয়সার জোরে লেখা ছাপাচ্ছেন। একদল স্তাবক নিজনিজ স্বার্থে তাঁকে মাথায় তুলছে। এখন তিনি ও তাঁর অনুগামীরা 'চাবকাতে' এসেছেন রবীন্দ্রনাথের আসল চেহারাটা দেখাতে একথা দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন। দু চারটি উদাহরন দেওয়া যাক। এমন হাজার হাজার ছিল।

১।কড়ি ও কোমলের প্যারডি করে কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ একটা মস্ত ছড়া বানিয়েছিলেন। তার অংশবিশেষ এইরকম –

"চুনোগলি হার মেনেছে"
        মৌলিকতা দেখে
যত মুদিমালা বাংলা পড়ে
        রবিঠাকুর লেখে।
তোর বক্‌বকম অর ফোঁসফোসানি
        তওে কবিত্বের ভাব মাখা
তাও ছাপালি গ্রন্থ হল
        নগদ মূল্য এক টাকা।"

২। রবীন্দ্রনাথ অনেক লিখিয়াছেন, অনেক ছাপিয়াছেন। এখনও যে তিনি যা তা ছাপাইবার লোভ সংবরন করিতে পারেন না, ইহাহ আমাদের বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়।"

৩। "ইদানিং রবীন্দ্রনাথ ভক্তবৃন্দের বগলেই বিরাজ করেন, দর্শন দুর্ঘট। বিস্ময়ের কথা এই যে দেখিতে দেখিতে জগতের সাহিত্য এত দরিদ্রপ্রায় দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে যে রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগনিত হইলেন। কোন কোন সুধী এই জগৎব্যপ্ত কবি জরিপের সার্ভেয়ার ছিলেন তাহা বলিতে পারিনা।"

৪। "সাধনার প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্প শাস্তি। লেখক গল্পটি লিখিয়া কাহাকে শাস্তি দিতে চাহেন বুঝিতে পারিলাম না। যদি পাঠককে শাস্তি দেওয়াই তাঁহার লক্ষ্য হয় তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে।"

৫। এছাড়া সোনার তরী অর্থহীন অসংলগ্ন প্রলাপমাত্র, চোখের বালি দন্ডযোগ্যরূপে অশ্লীল, ছোটোগল্পগুলি এত নীরস যে পড়িতে ইচ্ছা করে না, হিতবাদীতে ছটি গল্প প্রকাশ হওযায় হিতবাদীর গ্রাহক সংখ্যা কমে গেছে, তাঁর অনেক রচনাই যে চুরি (যদিও কোথা থেকে চুরি তা বলা হয় নি) এসব কথা তো ছিলই।

৬। সবচেয়ে মারাত্মক ছিল ব্যক্তিগত আক্রমন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখলেন 'প্রণয়ের পরিণাম' গল্প। এ গল্পে শুধু নামধামগুলি কাল্পনিক। তাছাড়া সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র রবীন্দ্রনাথ ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কোনো না কোনো ব্যক্তির জীবনের সুপরিচিত সত্য ঘটনা। কাজেই পাঠকের বুঝতে ভুল হবে না কাদের কথা বলা হচ্ছে। এই তথাকথিত সত্য বিবরনের মধ্যে লেখা সুকৌশলে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন এমন কোন না কোন মিথ্যা কাহিনী যা অত্যন্ত জুগুপ্সিত ও মর্যদাহানিকর। চরিত্রহননের এরকম কৌশলী দৃষ্টান্তের তুলনা মেলা ভার। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা এই যে স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালও শেষ পর্যন্ত তাঁর মোসাহেবদের উস্কানিতে এই ঘৃন্য খেলায় মেতেছিলেন। অথচ এই দ্বিজেন্দ্রলালেরই তিনখানি বইয়ের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দুদিন আগেও এঁরা ছিলেন পরস্পরের বন্ধু। ঈর্ষা মানুষকে কতদূর ভ্রষ্ট করে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দবিদায়' তার নিদর্শন। শান্তিনিকতনের মত আশ্রমবাসী এক চতুর ও ভন্ড গুরুর চরিত্রউদ্‌ঘাটন এই নাটকের বিষয়। এক এক করে এইসব লেখা বেরোত আর, আর লোকে উল্লাসে ফেটে পড়ত। কারন লোকে নিন্দা ভালবাসে, নিন্দায় বিশ্বাস করে। আমজনতার এই দুর্বলতার খবর এক শ্রেনীর লেখক সম্পাদকেরা চিরকালই জানেন। এতে কাগজ জনপ্রিয় হয়। ব্যবসা বাড়ে। কারও কারও

ঈর্ষা চরিতার্থ হয়। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে সজনীকান্ত দাসও তো এই একই কৌশলে শনিবারের চিঠির আসর মাতাতেন।

রবীন্দ্রনাথের উত্তর

একবারে প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলেন। যেমন তাঁর কবিতাকে যে ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়া ছায়া আস্পষ্ট, এবং 'কাব্যি' বলা হয়েছিল, তার। তিনি সেখানে কাউকে কোনও আক্রমণ না করে চিরন্তন সাহিত্যধর্মের কথা বলেন। দেখান প্রকৃতির নিয়মেই যেমন মানবমনের কিছু ভাব স্পষ্ট এবং কিছু অস্পষ্ট, কাব্যেও তেমনি সব কথা স্পষ্ট করে বলা যায় না। বললে তা আর কবিতা থাকে না। এইরকম আরও দু একটিমাত্র লেখা ছিল। এর পর তিনি কারও নিন্দাবাদের আর কোনো উত্তর কখনো দেন নি। শান্তভাবে উপেক্ষা করেছেন। এমন কি নিজের বন্ধুদেরও প্রতিবাদ করতে বারণ করেছেন।

এই যুগের রবীন্দ্রনাথকে নীরস সি চৌধুরী বলেছেন "আত্মসমাহিত"। এ কথা সর্বাংশে সত্য। অজস্রধারায় তখন তাঁর নানাবিধ রচনা নির্গত হচ্ছে। তাঁর জীবনের সেটা সবচেয়ে ফলবান পর্ব, ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর। তারপর চল্লিশ পার হবার অব্যবহিত পর থেকে তাঁর ব্যক্তিজীবনে নেমেছে নানা সংকট। তার মধ্য দিয়ে তিনি আত্মস্থ হতে চেষ্টা করছেন প্রাণপনে। এই সবের মধ্যে বাইরের জগতের ইতর কোলাহলকে তিনি মনের ভিতর প্রবেশ করতে দিতেন না, অন্তত কিছু লেখবার সময়ে তো বটেই। সে সময়ে তিনি নিজের মধ্যেই বিভোর থাকতেন। সোনার তরীর পুরস্কার কবিতায় একটি প্রতীকী গল্প আছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী জানতে গল্পটি প্রাসঙ্গিক। সেই গল্পে এক অকিঞ্চন দরিদ্র কবি পত্নীর তাড়নায় রাজার কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিল। রাজসমীপে উপস্থিত হয়ে সে কিন্তু রাজার বন্দনা না করে সরস্বতীবন্দনা করেত শুরু করে। দীর্ঘ সে বন্দনা। তার মধ্যে সেই কবি একজায়গায় বলেছে–

দেবী সরস্বতীর কৃপায় তিনি তাঁর অলৌকিক বীনাধ্বনি শুনতে পেয়েছেন।

"যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী
জানে না আপনা জানে না ধরনী–
        সংসার কোলাহল।
সে জন পাগল পরাণবিকল
ভবকূল হতে ছিঁড়িয়া শিকল
কেমনে এসেছে ছাড়িয়া সকল
        ঠেকেছে চরনে তব–
তোমার অমল কমলগন্ধ
হৃদয়ে ঢালিছে মহা আনন্দ
অপূর্ব গীত আলোকছন্দ
        শুনিছে নিত্য নব।"

এই ছিল তাঁর সে সময়কার মনের কথা।

তবু কবিও তো একজন মানুষ। সবসময়ে সে কল্পজগতের তূরীয় লোকে বিহার করে না, মাটির পৃথিবীতেও নামে। তারও নানা মানবিক চাহিদা থাকে এবং কবিদের সবচেয়ে বড় চাহিদা তাঁর কাব্যের জন্য সমঝদারের। তাই যখন নিন্দুকের উচ্চরোলে তাঁর গুনগ্রহীরা কোনঠাসা ও রুদ্ধকন্ঠ তখন রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সুখ অনুভব করতেন না। তাঁর মনে বেদনাবোধ ছিল, অভিমান ছিল, ক্ষোভও ছিল। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে বলেছেন– "জীবন প্রদীপের তেল তো খুব বেশি নয়, সবই যদি রোষে দ্বেষে হু হু শব্দে জ্বালাইয়া ফেলি, তবে ভালবাসার কাজে এবং ভগবানের আরতির বেলায় কি করিব।" কিন্তু বললে কি হবে ক্রোধের হাত থেকে নিস্তার পাননি তিনিও।একবারের জন্য হলেও রুদ্ধ আগ্নেয়গিরিতে বিস্ফোরণ হয়েছিল। যখন নোবেল পুরস্কারের খবর পেয়ে কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনে দলে দলে, লোক শান্তিনিকেতনে গিয়ে হাজির হল তাঁকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য, তখন তাঁর আর সহ্য হয় নি। সম্বর্ধনাসভায় তিনি যা বলেছিলেন তার মর্ম এই যে এতকাল তাঁর নিজের দেশের লোকের হাত থেকে তিনি আঘাত ও অপমানই পেয়ে এসেছেন। তাতেই তিনি অভ্যস্ত। আজ বিদেশ তাঁকে সম্মান দিয়েছে বলেই সেই লোকেরাই তাঁকে সম্মান জানাবে এটা তিনি চান না। তাঁদের দেওয়া সম্মানের পাত্র তিনি ওষ্ঠে স্পর্শ করলেও অন্তরে গ্রহণ করেন নি

একথা তিনি পরিষ্কার ভাবে জানালেন। সম্পূর্ণ অরাবীন্দ্রিক এই রবীন্দ্রনাথ হয়ত বা আমাদের হৃদয় আরও বেশী করে স্পর্শ করেন। খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে এখানে এক অভিমানী মানুষকে আমরা হৃদয়ের কাছে পেয়ে যাই।

এ অবস্থায় পরিবর্তন হয়েছিল। পরে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতির সামনে কোনও ইতর সমালোচনা মাথা তুলতে পারেনি। তাঁর রচনার ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা দুইই হয়েছে। দেশেও বিদেশে তাঁর ব্যক্তিত্বের নানা প্রকাশ নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। সে ইতিহাস আলাদা।